30 January, 2023

বণিক বার্তা

আলোকপাত

আব্দুল বায়েস

কঠিন সময় এবং অবিশ্বস্ত অর্থনীতিবিদ

এক.

'পৃথিবী বদলে গেছে যা দেখি নতুন লাগে...' কিশোর কুমারের গাওয়া এ গানের মতো বাংলাদেশ নাকি বদলে গেছে, যা দেখি নতুন লাগে। সমালোচকদের ধারণা এ দেশে গণতন্ত্র আর বিতর্কের পরিবেশ ক্রমে কুঞ্চিত হয়ে পড়েছে; সংলাপের পথ সরু হয়ে আসছে। অবস্থা অনেকটা হয় তুমি নয় আমি। তবে 'ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস' এমনটি নিশ্চিত নন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ ব্যানার্জি ও এস্থর ডুফলো। ২০১৯ সালে তাদের রচিত বই 'কঠিন সময়ের জন্য ভালো অর্থনীতি' (Good Economics for Hard Times) বলছে : 'আমরা বর্তমানে বাস করছি এমন একটা যুগে যখন মেরুকরণ বেড়েই চলেছে। হাঙ্গেরি থেকে ভারত, ফিলিপাইন থেকে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন থেকে ব্রাজিল, ইন্দোনেশিয়া থেকে ইতালি সবখানে ডান ও বামের সংলাপগুলো উচ্চতর ধ্বনিসমৃদ্ধ দীর্ঘ পারস্পরিক গালিগালাজ; অব্যাহতভাবে ছোড়া কর্কশ শব্দ অতিক্রান্ত পথ ধরে ফিরে আসার সুযোগ দেয় খুব কম।' প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে বিখ্যাত সেই বইটিই, ক্ষেত্রবিশেষে ভাষান্তরে, বর্তমান নিবন্ধের উৎস।

খোদ মার্কিন মুল্লুকের কথা দিয়ে হারানো দিনের গল্পের শুরু হয়। ওই দেশে যারা কোনো একটা বিশেষ দলের সমর্থক আছেন, তাদের প্রায় ৮০ ভাগ নাকি অন্য দলের প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। যেমন ডেমোক্র্যাট সমর্থকদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মনে করেন রিপাবলিকানরা সাম্প্রদায়িক, গোঁড়া এবং যৌনবৈষম্যবাদী। আবার অর্ধেকেরও কিঞ্চিৎ বেশি রিপাবলিকানের বদ্ধমূল বিশ্বাস যে ডেমোক্র্যাটরা বিদ্বেষপূর্ণ। মজার ব্যাপার হলো, সমগ্র মার্কিনদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ হতাশ হয় যখন পরিবারের ঘনিষ্ঠ একজন সদস্য অন্যপক্ষের কাউকে বিয়ে করে। সুতরাং, গণতন্ত্র ও বিতর্কের ওপর নির্মিত সভ্যতা, হোক তা ফ্রান্স কিংবা ভারতে এখন যে হুমকির মুখে তা বলাই বাহুল্য।

দুই.

অভিজিৎ ও এস্থার মনে করেন সমাজবিজ্ঞানীদের কাজ হচ্ছে ঘটনা উপস্থাপন করা এবং ঘটনার যথাযথ ব্যাখ্যা দেয়া। এটা ঘটলে বিদ্যমান বিভাজন প্রশমিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। প্রত্যেক পক্ষকে বোঝানো অন্যপক্ষ কী বলছে-এমন প্রক্রিয়া ঐকমত্য না হলেও কিছুটা যৌক্তিক ভিন্নমত পোষণে সাহায্য করবে বলে বিশ্বাস। মনে রাখা দরকার যে যদি উভয় পক্ষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থাকে তাহলে মতদ্বৈধতার মাঝেও গণতন্ত্র বাস করতে পারে। কিন্তু শ্রদ্ধা-সৃষ্টির পূর্বশর্ত হচ্ছে খানিক বোঝাপড়া যা নেই বলেই যত সমস্যা। বর্তমান অবস্থাকে বিশেষ উদ্বিগ্ন ভাবার কারণ সংলাপের জায়গাটুকু সংকুচিত হয়ে আসছে। শুধু রাজনীতি নিয়ে নয়, এমনকি মূল সামাজিক সমস্যা শনাক্তকরণ এবং সমাধানের পথ খোঁজার মধ্যেও এক ধরনের গোত্রীয় মনোভাব (Tribalization of views) লক্ষণীয়। একটা বড় সমীক্ষায় দেখা যায়, বিস্তৃত বিষয়ের ওপর দেয়া মতামতগুলো আঙুরের গুচ্ছের মতো একত্রে আসতে থাকে। যেমন যারা মূল কিছু বিশ্বাসে অংশীদার তারা বিভিন্ন ইস্যুতে একই মতামত নিয়ে আসেন; হোক সে অভিবাসন, আয়বৈষম্য কিংবা সরকারের ভূমিকা বিষয়ক। নীতিমালার ক্ষেত্রে তাদের অভিমত প্রকাশে বেশি প্রাধান্য পায় এ মূল বিশ্বাসগুলো : কোথায় তারা বাস করে। তাদের আয় অথবা তাদের জনমিতিক বৈশিষ্ট্য পড়ে থাকে পেছনে।

পৃথিবীর সবখানেই রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু দখল করে আছে অভিবাসন, বাণিজ্য, কর কিংবা সরকারের ভূমিকা ইত্যাকার বিষয় যা আবার বিবাদের উৎস। কিন্তু এগুলোর ওপর করা মন্তব্য অনেক সময় ব্যক্তিগত বিশেষ বিশ্বাসের ওপর স্থাপিত হতে দেখা যায় এবং দুঃখজনক হলেও সত্যি, এর সমর্থনে কিছু মনগড়া সংখ্যা আর খুব সরলরৈখিক ব্যঞ্জনার বাড়াবাড়ি দৃষ্টি এড়ায় না। আফসোস আরো এই যে এই ইস্যুগুলো নিয়ে কেউ অত্যন্ত ক্লেশকর চিন্তাভাবনা করে না।

তিন.

তবে স্বীকার করতেই হয় যে এ প্রবণতা বেশ ধ্বংসাত্মক বিশেষত যখন আমরা দুঃসময়ে পড়েছি। বাণিজ্য বিস্তৃতি এবং চীনের চিত্তাকর্ষক অর্থনৈতিক সাফল্যের ফলে লব্ধ বৈশ্বিক প্রবৃদ্ধির রমরমা অবস্থা এখন আর আগের মতো নেই। সব জায়গায় বাণিজ্যযুদ্ধ এবং চীনের শ্লথ প্রবৃদ্ধির কারণে হয়তো সেই দিন সমাপ্ত প্রায়। এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার যেসব দেশ স্ফীত স্রোতে সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল তারা এখন ভাবছে তাদের জন্য এরপর কী অপেক্ষা করছে। অবশ্য শ্লথ প্রবৃদ্ধি উন্নত বিশ্বে অপরিচিত নয় কিন্তু যেটা উদ্বেগজনক তা হলো এসব দেশে প্রতীয়মান সামাজিক চুক্তির দ্রুত তন্তুসার হওয়া; অনেকটা যেন চার্লস ডিকেন্সের উপন্যাস 'কঠিন সময়' (Hard Times)-এর মতো, যাদের আছে (হ্যাভস) তারা ক্রমবর্ধিষ্ণু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে যাদের নেই (হ্যাভ-নটস) তাদের কাছ থেকে এবং এক্ষেত্রে কোনো সিদ্ধান্ত/আপস দৃশ্যমান আছে বলে মনে হয় না।

নিঃসন্দেহে বর্তমান সংকটের কেন্দ্রে আছে অর্থনীতি এবং অর্থনৈতিক নীতিমালার প্রশ্নগুলো। যেমন কীভাবে প্রবৃদ্ধি বাড়ানো যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কি সমস্যা না সমাধান এবং বৈষম্য সৃষ্টিতে এর প্রভাব কী, কেন সর্বত্র বৈষম্য ব্যাপক, স্থানীয় কর্মসংস্থানে নতুন প্রযুক্তি ও অভিবাসনের প্রভাব প্রভৃতি। এসব বিষয় নিয়ে নানা প্রশ্ন এবং উদ্বেগ উদ্বেলিত।

যা-ই হোক, এসবের উত্তর শুধু 'টুইট' করে দেয়া যায় না বিধায় এদের উপেক্ষা করার প্রবণতা প্রকট থাকাই স্বাভাবিক। অবশ্য অর্থনীতিবিদরা পারেন এ সন্ধিক্ষণে কিছুটা হলেও হাত বাড়াতে। কারণ তারাই তো এসব বিষয় নিয়ে বেশি ভাবেন, গবেষণা চালান এবং সুপারিশমালা তৈরি করে থাকেন। যথা- বাণিজ্যের সুবিধা-অসুবিধা, স্থানীয় অর্থনীতিতে অভিবাসনের প্রভাব, আয়বৈষম্য, বাজারের সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র শ্রেণী ইত্যাদি।

> নিঃসন্দেহে বর্তমান সংকটের কেন্দ্রে আছে অর্থনীতি এবং অর্থনৈতিক নীতিমালার প্রশ্নগুলো। যেমন কীভাবে প্রবৃদ্ধি বাড়ানো যায়, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কি সমস্যা না সমাধান এবং বৈষম্য সৃষ্টিতে এর প্রভাব কী, কেন সর্বত্র বৈষম্য ব্যাপক, স্থানীয় কর্মসংস্থানে নতুন প্রযুক্তি ও অভিবাসনের প্রভাব প্রভৃতি। এসব বিষয় নিয়ে নানা প্রশ্ন এবং উদ্বেগ উদ্বেলিত। এসবের উত্তর শুধু 'টুইট' করে দেয়া যায় না বিধায় এদের উপেক্ষা করার প্রবণতা প্রকট থাকাই স্বাভাবিক। অবশ্য অর্থনীতিবিদরা পারেন এ সন্ধিক্ষণে কিছুটা হলেও হাত বাড়াতে। কারণ তারাই তো এসব বিষয় নিয়ে বেশি ভাবেন, গবেষণা চালান এবং সুপারিশমালা তৈরি করে থাকেন। যথা- বাণিজ্যের সুবিধা-অসুবিধা, স্থানীয় অর্থনীতিতে অভিবাসনের প্রভাব, আয়বৈষম্য, বাজারের সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র শ্রেণী ইত্যাদি। কিন্তু মূল সমস্যা হচ্ছে এই যে খুব কম লোকই অর্থনীতিবিদদের ওপর যথেষ্ট বিশ্বাস রাখে এবং তাদের কী বলার আছে তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে চায়

চার.

মূল সমস্যা হচ্ছে এই যে খুব কম লোকই অর্থনীতিবিদদের ওপর যথেষ্ট বিশ্বাস রাখে এবং তাদের কী বলার আছে তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে চায়। যেমন ব্রেক্সিট নিয়ে ভোটের আগে ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদরা যথেষ্ট কসরত করেছেন এটা বোঝাতে যে ব্রেক্সিট হবে খুব ক্ষতিকারক, কিন্তু সবই গরল ভেল, তাদের কথায় কেউ পাত্তা পর্যন্ত দিল না। ২০১৭ সালে ব্রিটেনে চালানো এক জনমত জরিপে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'যখন নিজেদের দক্ষতার বিষয়ে কথা বলা হয়, কার মতামতকে আপনি সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করেন?' সে জরিপে চার-পঞ্চমাংশ উত্তরদাতার সমর্থন পেয়ে সবচেয়ে ওপরে ছিল নার্স বা সেবিকা সম্প্রদায় আর ২০ শতাংশ উত্তরদাতার বিশ্বাস নিয়ে সবচেয়ে নিচে ছিল রাজনীতিবিদ। অর্থনীতিবিদ ২৫ শতাংশের বিশ্বাস নিয়ে রাজনীতিবিদের প্রান্তিক ওপরে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়। ২০১৮ সালে আমেরিকায় ১০ হাজার লোকের ওপর চালানো জনমত জরিপেও দেখা গেল যে মাত্র ২৫ শতাংশ মানুষ বিশ্বাস করে যে নিজের বিষয়ে অর্থনীতিবিদদের কিছু বলার দক্ষতা আছে।

এ বিশ্বাস ঘাটতির পেছনে কাজ করে অনেক কারণ। এর প্রথম প্রতিফলন দেখা যায় যখন পেশাজীবী অর্থনীতিবিদদের ঐকমত্য (আদৌ যদি থাকে) সাধারণ মানুষের মতামত থেকে প্রণালিবদ্ধভাবে আলাদা, যেন উত্তর মেরু আর দক্ষিণ মেরু। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় নিয়মিত ৪০ জন প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদের (বুথ প্যানেল) এবং জনগণের কাছ থেকে বিভিন্ন ইস্যুতে যে মতামত সংগ্রহ করে থাকে যেখানেও একই অবস্থা বিরাজ করে। যেমন অর্থনীতিবিদদের ৪০ শতাংশ মনে করেছিলেন ২০১৫ সালে জার্মানির দিকে প্রবাহিত অভিবাসন স্রোত আসছে দশকে অর্থনৈতিক সুবিধা বয়ে আনবে অথচ এ মতের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছিল ৩৫ শতাংশ সাধারণ মানুষ, মাত্র এক-পঞ্চমাংশ একমত হয়েছিল অর্থনীতিবিদদের ইতিবাচক ধারণার সঙ্গে। বাণিজ্য চুক্তি নাফটার ফলে একজন গড়পড়তা মানুষের মঙ্গল বৃদ্ধি করেছে এমন ধারণা ৯৫ শতাংশ অর্থনীতিবিদের যেখানে এমনটি ভাবে ৪৬-৫১ শতাংশ সাধারণ উত্তরদাতা। মোট কথা, গড়পড়তা একাডেমিক অর্থনীতিবিদরা যা ভাবেন তা গড়পড়তা মার্কিনদের চেয়ে আলাদা। এমনকি এটা বলাও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে আমজনতার একটা বড় অংশ অর্থনীতিবিদদের কাছ থেকে অর্থনীতিবিষয়ক কোনো কিছু শোনা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছে।

তাই বলে এক মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করার অবকাশ নেই যে যখন অর্থনীতিবিদ আর জনগণের ধারণা আলাদা, তখন সবসময় অর্থনীতিবিদরাই ঠিক বলেন। 'আমরা, অর্থনীতিবিদরা, প্রায় অতিরিক্তভাবে মডেল আর মেথডে মোড়ানো থাকি এবং কখনোসখনো ভুলে যাই কোথায় বিজ্ঞানের শেষ এবং কোথায় ভাবাদর্শের শুরু। নীতিমালাসংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর আমরা দিই পূর্ব ধারণার (Assumptions) ওপর ভিত্তি করে...এগুলো আমাদের মডেলের নির্মাণ-পাথর কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে এরা সবসময়ই শুদ্ধ ...কিন্তু আমাদের এমন উপকারী বিশেষ বিজ্ঞান ও দক্ষতা আছে যা অন্য কোথাও নেই।'

তার জন্য জানা দরকার অর্থনীতিবিদদের ওপর বিশ্বাস কুরে কুরে খায় কে বা কীভাবে। এ প্রশ্নের উত্তরের একটা অংশে আছে চারদিকে থাকা খারাপ অর্থনীতি (Bad Economics)।

যারা পাবলিক ডিসকোর্সে 'অর্থনীতিবিদদের' প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন, তারা প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ নিয়ে গঠিত বুথ প্যানেলের সদস্য নন বরং টিভি এবং প্রেসে হাজির হওয়া স্বঘোষিত অর্থনীতিবিদরা, কেউ অমুক ব্যাংকের বা কারখানার প্রধান অর্থনীতিবিদ, দুএকটা ব্যতিক্রম বাদে, প্রধানত তাদের প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত মুখপাত্র যারা অবলীলায় সাক্ষ্যপ্রমাণের ভার অবজ্ঞা করে চলেন।

দুর্ভাগ্যবশত, তারা দেখতে কী রকম (টাই-স্যুট পরিহিত) অথবা যেভাবে কথা বলে (অনেক বিভাষা বা জারগণের ব্যবহার), তাতে মনে হবে তারা বুঝিবা ঝানু অর্থনীতিবিদ। তাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আস্থার সঙ্গে ভবিষ্যদ্বাণী করা দুর্ভাগ্যবশত যা তাদের কর্তৃপক্ষীয় করে তোলে।

দ্বিতীয় যে বিষয়টি বিশ্বাসে ঘাটতি ঘটায় তা হলো একাডেমিক অর্থনীতিবিদরা তাদের অধিকতর সরল উপসংহারের পেছনে যে জটিল যুক্তি থাকে তা তারা ব্যাখ্যা করতে ইচ্ছুক নন অথবা এটা করার সময় তাদের আছে সামান্যই। তাছাড়া টিভির উপস্থাপক বিস্তারিত বলার আগেই চিলের মতো ছোঁ মেরে কথা নিয়ে যায় এবং সম্ভবত এজন্য একাডেমিক অর্থনীতিবিদ প্রায় নির্ভয়ে মতামত দিতে অনিচ্ছুক থাকেন। অর্থনীতিবিদের কথা ভালো করে বুঝতে এবং শুনতে সময় লাগে বেশ এবং কথার মারপ্যাঁচে মূল বিষয়ের ব্যাখ্যা অন্যরকম দাঁড়ানোর ঝুঁকি থাকে প্রচুর।

নির্দ্বিধায় কথা বলার লোক যে নেই তা নয়, তবে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, তাদের মতামত খুবই শক্ত এবং আধুনিক অর্থনীতির সবচেয়ে ভালো কাজে যুক্ত হওয়ার ধৈর্য একেবারে কম মনে হয়। কেউ আছেন বহু আগে বাতিল হওয়া ধারণা আগলে আছেন, পুরনো কথা মন্ত্রের মতো আওড়ান, মতের সঙ্গে না মিললে রাগে অগ্নিশর্মা হন। আর এক দল আছেন যারা মূল স্রোতের অর্থনীতিকে নিন্দা জানানোয় ব্যস্ত, এটা হয়তো তার প্রাপ্য, কিন্তু আজকের সর্বোত্তম অর্থনৈতিক গবেষণায় কথা বলার সম্ভাবনা কম।

এতকিছুর পরও অর্থনীতিবিদ ভরসা মম। তথ্য-উপাত্ত আর সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে তারাই পারেন সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে অর্থনীতির অগ্রযাত্রা এবং মানুষের কল্যাণ বৃদ্ধি করতে।

পাদটীকা :

এক নারী তর ডাক্তারের কাছ থেকে জানতে পারলেন যে তিনি আর মাত্র ছয় মাস বাঁচবেন। ডাক্তার তাকে এও উপদেশ দিলেন এরই মধ্যে তিনি যেন একজন অর্থনীতিবিদকে বিয়ে করেন।

নারী : 'ওতে কি আমার অসুস্থতা দূর হয়ে যাবে ডাক্তার?'

ডাক্তার : 'না, তবে ছয় মাস মনে হবে অনেক লম্বা সময়।'

আব্দুল বায়েস : অর্থনীতিবিদ; জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ও অধ্যাপক
বর্তমানে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির খণ্ডকালীন অধ্যাপক